গুপি গাইনের জুতো

ডাঃ পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার
Email : pbsarkar@gmail.com

গুপি-বাঘার গানবাজনা শুনে ভূতের রাজা ওদের একজোড়া জুতো উপহার দিয়েছেলেন। সে এক আজব জুতো। যেমনি তার জেল্লা তেমনি তার কাজ। সেই জুতো পায়ে দিয়ে দুজনে হাতে হাতে তালি দিলেই নিমেষে যেকোনো জায়গায় পৌঁছান যায়। সেই জুতো পরে গুপি-বাঘা কতই না রোমহর্ষক কাণ্ড ঘাটিয়েছে। হাল্লার ধূর্ত মন্ত্রীর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুণ্ডিরাজ্য আক্রমণ ঠেকিয়ে বন্দী রাজাকে উদ্ধার করেছে। হাল্লার রাজকুমারীকে উড়িয়ে এনেছে সুণ্ডির প্রাসাদে, বাঘার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য। হীরক রাজার ষড়যন্ত্র বানচাল করে তাকে কুপোকাত করেছে। এমনই আরও কত কাণ্ড আমরা দেখেছি সত্যজিত রায়ের অনবদ্য সিনেমাগুলিতে। কিন্তু 'গুগাবাবা ফিরে এল'-র পরে জুতোগুলোর আর কোনো খবর নেই। সেগুলো কি আবার ভূতের রাজার কাছে ফিরে গেল নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি গুপি-বাঘার সেই জুতো বর্তমানে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে ভারতের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। ওগুলো এখন ভারতের জাতীয় সম্পদ, অত্যন্ত গর্বের জিনিস। মিউজিয়ামের কাঁচের বাক্সে তারা ঝলমল করছে। অগণিত মানুষ প্রতিদিন জুতোগুলো দর্শণ করে শিহরিত হন। বিদেশী পর্যটকরা নাকি সুরে বলে ওঠেন 'ইনক্রেডিবল'।

এরই মধ্যে একদিন টিভির ব্রেকিং নিউজ আর সমস্ত খবরের কাগজের হেড লাইন –

'ন্যাশানাল মিউজিয়াম থেকে গুপি গাইনের জুতো চুরি'

খবরে প্রকাশ গতকাল গভীর রাত্রে মিউজিয়ামের তালা ভেঙে দুঃসাহসী চোর আমাদের জাতীয় সম্পদ গুপি গাইনের জুতোজোড়া চুরি করেছে। অথচ বাঘা বাইনের জুতো যথাস্থানেই রয়েছে।

এই খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনে আলোড়ন পড়ে যায়। পুলিশ চিরুনি তল্লাসি শুরু করে আসেপাশের সমস্ত অঞ্চলে। গড়া হয় বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু কোনো কাজ না হওয়ায় অবশেষে নিরুপায় হয়ে সিআইডিকে দ্বায়িত্ব দেওয়া হল জুতোজোড়া খুঁজে দেবার জন্য। পাঁচ মাস পরেও তারা এর কোনো কিনারা করতে পারেনি। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সেই নোবেলও আর পাওয়া গেল না, জুতোজোড়াও রয়ে গেল অধরা।

আমি একজন সামান্য স্কুল শিক্ষক। কিন্তু নেশা দেশভ্রমণ। যখনই সময় পাই আমি বেরিয়ে পড়ি নেশার টানে। এবার পূজোয় কিছু অর্থাগম হয়েছিল। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। ভাবলাম কানহা ফরেস্টটা ঘুরে আসা যাক। তা একদিন ট্রেনে চাপলাম কানহার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে যথারীতি ক্যামেরা, বাইনোকুলার আর টুকিটাকি জিনিসপত্র।

সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে, নানা জীবজন্তু দেখে, ছবি তুলে ক্লান্ত হয়ে একটা ছোটো ঢিবিতে বসে পড়লাম। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে চুমুক দিতে দিতে এদিক ওদিক দেখছি। এমন সময় চোখে পড়ল একটু দূরে, ঝোপের মধ্যে ওটা কি? একপাটি জুতো না? কাছে গিয়ে জুতোটা হাতে নিয়ে চমকে উঠলাম। আরে এ তো গুপির জুতো ! চিনতে কি আর ভুল হয়? কতবার দেখেছি সিনেমায় আর ন্যাশানাল মিউজিয়ামে।

একপাটি যখন পেয়েছি অন্যটাও নিশ্চয়ই আছে কাছেপিঠে কোথাও। তন্যতন্য করে খুঁজতে থাকলাম। ঘন্টাখানেক পরে সেটাও পেলাম পিছনের একটা বড় পাথরের খাঁজে। চোর বোধহয় এখানে এসেছিলো, কিন্তু কোনো কারণে ভয় পেয়ে জুতোজোড়া ফেলেই পালিয়েছে।

যাক দুপাটিই পাওয়া গেল অবশেষে। গুপির সেই ঐতিহাসিক ভূতুড়ে জুতো এখন আমার হাতে। গায়ের লোমগুলো খাঁড়া হয়ে উঠছিল বারবার। আরাম করে বসে ঠাণ্ডা মাথায় জুতোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলাম। কী অসামান্য জেল্লা, কী অসাধারণ কারুকার্য। জুতোর তলাটা দেখছি, এমন সময় কোথায় যেন চাপ লেগে খুট করে মৃদু শব্দ হল আর সোলের একটা ঢাকনা খুলে গেল। চোখ ছানাবড়া। আরে এ তো দেখছি একটা ভীষণ জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ভিতরে একটা কমপার্টমেন্ট। সেটা অজস্র ইলেকট্রনিক সার্কিট, ট্রানজিস্টার ইত্যাদি জটিল যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ছোটো ছোটো রঙ্গিন এলইডি আলো পিটপিট করছে। একটা মাইক্রোসুইচ দেখলাম। তার একদিকে ডি অন্যদিকে এস লেখা। মনে হয় ডি মানে দুইজনের আর এস মানে একজনের ব্যবহারের জন্য। আমি সেটা এস-এ সেট করে দিলাম।

কিন্তু এই জুতো কি আমার উপর কাজ করবে? পরীক্ষা করবার জন্য জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে, দুহাতে তালি বাজিয়ে বললাম 'আমার বাড়ি'। বোধহয় কয়েক সেকেণ্ড বেহুঁশ ছিলাম। চোখ মেলে দেখি আমি আমার ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে আছি। চাকরটা ঘরে কাজ করছিলো। আমাকে দেখে গোঁ গোঁ করতে লাগল। আমি ধমক দিয়ে বললাম 'চুপ কর হতভাগা। আমি তোর বাবু। যা, এককাপ কফি করে আন।'

শুয়ে শুয়ে ভাবলাম এবার আমার করণীয় কি? এই জুতো তো ভারতের জাতীয় সম্পত্তি। এটা ন্যাশানাল মিউজিয়ামে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু তার আগে দুচার দিন আমি যদি একটু এদিক ওদিক ঘুরে নিই তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ হবে না। আমার মন সায় দিল।

ঠিক করলাম প্রথমেই যাব সেই জঙ্গলে যেখানে গুপি–বাঘা ভূতের রাজার কাছ থেকে তিনটে অসাধারণ বর পেয়েছিলো। আর ছিল অনবদ্য এক ভূতুড়ে নাচ। কিন্তু দিনের বেলা তো ভূতের দেখা পাওয়া যায় না। তাই পরদিন বেলা পড়ে এলে জুতো পায়ে দিয়ে দুহাতে তালি বাজিয়ে বললাম 'ভূতের রাজার জঙ্গল'।

নিমেষে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু এ কোথায় এলাম? এটা তো একটা বিরাট হাউসিং কমপ্লেক্স। একদিকে গোটাকতক আধমরা গাছ আছে বটে, কিন্তু সেই ঘোর জঙ্গল কোথায়? নিশ্চয়ই ভুল জায়গায় এসেছি। অথচ আমার মোবাইলের জিপিএস জানাচ্ছে এটাই ভূতের রাজার জঙ্গল।

পায়ে পায়ে ওই গাছ কটার কাছে গিয়ে বললাম 'মহারাজ দেখা দিন। আমি অনেক দূর থেকে আসছি আপনার দর্শনের আশায়।' কয়েকবার বলার পরে দূরে সেই বিখ্যাত তারামার্কা আলোটা জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে সেটা আমার সামনে এসে স্থির হয়ে ভেসে রইল। গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম 'প্রণাম মহারাজ। কেমন আছেন আপনারা?' হতাশা মেশানো উদাস গলায় ভূতের রাজা বললেন 'আমরা ভালো নেই রে। মানুষ জঙ্গলের গাছ কেটে বড়বড় বাড়ি বানাল। কত আলো জ্বলে সারারাত। আমরা সইতে পারি নে। থাকবার জায়গা নেই। বড় কষ্ট রে বড় কষ্ট।'

'আপনার চেলারা সব কোথায়?'

রাজা করুণ কণ্ঠে বললেন 'জঙ্গল আর নেই, ওদের থাকবার জায়গাও নেই। সবাই চলে গেছে। শুধু আমি পড়ে আছি মায়ার টানে। জানিনা এই গাছ কটাও ওরা কবে কেটে ফেলবে।'

আবার প্রশ্ন করলাম 'আচ্ছা গুপি-বাঘার জুতোগুলো আপনি কোথায় পেয়েছিলেন? ওগুলো বানানো তো মানুষের কাজ না।'

'জুতোগুলো আমি অন্য গ্রহ থেকে আনিয়েছিলাম। এখন আমার আর সেই তেজ নেই। বর দেবার ক্ষমতাও নেই। তোরা ভালো থাকিস আর মানুষকে বলিস গাছ না কটতে। বলার সাথে সাথে তারার আলোটা ধীরে ধীরে শুন্যে মিলিয়ে গেল।

ভূতের রাজার দুঃখের কথা জেনে মনটা ভারী হয়ে গেল। ভাবলাম হাউজিং কমপ্লেক্সটা একটু ঘুরে দেখি। বিশাল কমপ্লেক্স, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটে সিকিউরিটি। কি নেই সেখানে? সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম, ওষুধের দোকান, ব্যাঙ্ক সব আধুনিক উপকরণই রয়েছে। সামনে বিরাট সবুজ লন সমেত তিরিশতলা টাওয়ারগুলো দেখতে অসাধারণ। একটা বেঞ্চে কয়েকজন বয়স্ক লোককে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা এই কমপ্লেক্সটা কতদিন আগে তৈরি হয়েছে?' 'তা, প্রায় দশ বছর তো হবেই।' উত্তর দিলেন একজন।

বললাম ‘জানেন তো এখানে আগে ভূতের রাজার একটা জঙ্গল ছিলো?’
তাম্ছিল্লের গলায় উত্তর দিলেন ‘শুনেছি বটে। সিনেমাতেও দেখেছি। কিন্তু সে তো কাল্পনিক, সিনেমার জন্য বানিয়ে লেখা।’ আমি আর ভেঙে বললাম না যে সেই রাজার সঙ্গে আমার এক্ষুনি দেখা হয়েছিলো। ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে।

এরপরে আমার গন্তব্য সুণ্ডিরাজ্য। ম্যাজিক জুতো পায়ে একেবারে সুণ্ডিরাজের প্রাসাদের সামনে এসে পড়লাম। কোথায় সেই পাগড়ি পরা বল্লম হাতে রাজার সিপাই? দেউড়িতে রয়েছে একজন খাঁকি পোশাক পরা দারোয়ান। তাকেই বললাম ‘মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।’ সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল ‘মহারাজা কে? এখানে তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকেন।’
বিস্ময়ভরা গলায় আমি জানতে চাইলাম ‘এখানে মহারাজা থাকেন না এখন?’ সে মাথা নাড়ালো।
‘বেশ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিন।’
সম্ভবত আমাকে সাংবাদিক ভেবে ভিতরে নিয়ে গেল।
মুখ্যমন্ত্রী সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ছিলেন। আমার আসার কারণ শুনে বললেন ‘এখন আর রাজতন্ত্র নেই, সবই গণতন্ত্র। এখানে বহুদিন ধরেই জনগণ নির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করছেন। প্রতি চার বছর অন্তর ইলেকশন হয়। জনতা ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করেন।’
প্রশ্ন করলাম ‘দেশে কি অনেকগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে?’
‘না, আমাদের মাত্র দুটি দল। আমদের দলের নাম আমার-সুণ্ডি, আর বিরোধীরা সুণ্ডি-বাঁচাও। ওরা বর্তমানে সংখ্যালঘু। গত ইলেকশানে গোহারান হেরেছে।’
জানতে চাইলাম দেশটা কি আগের চাইতে উন্নত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন ‘চলুন ছাদে গিয়ে আপনাকে সেটা দেখাই।’ প্রাসাদের ছাদ থেকে দেখলাম একটা সুসজ্জিত শহর। প্রশস্ত রাস্তাঘাট, সুন্দর ঘরবাড়ি, সুশৃঙ্খলিত জনতা। এককথায় অতি পরিচ্ছন্ন একটা আধুনিক শহর। মুখ্যমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে জানালেন ‘আমাদের এখানে বড় কোনো অশান্তি নেই। আমার দক্ষ মন্ত্রীদের কর্মতৎপরতায় জনগণ যথেষ্ট সুখী।’

এরই মধ্যে একদিন হিরক দেশটা ঘুরে এলাম। সেখানেও এখন গণতন্ত্র। জনগণ নির্বাচিত সরকার দেশ চালাচ্ছে। লোকজনের অবস্থা এখন অনেক ভালো। তারা খেয়েপরে আরামেই আছে। সেই অভিশপ্ত হিরকখনিটা সরকার অধিগ্রহণ করে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে অনেক উন্নত করে নিয়েছে। শ্রমিক অসন্তোষ আর নেই বললেই চলে, তবে ওদের একটা ইউনিয়ান আছে। মগজধোলাই ঘরটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমন ছিল তেমনই আছে। শুধু সংস্কার করে জনগণের দেখবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

হাল্লার দেশে যেদিন গেলাম সেদিন সেখানে বন্ধ চলছিল। নানা দাবী জানিয়ে স্লোগান দিয়ে আর পোষ্টার নিয়ে বিশাল জনতার মিছিল বেরিয়েছিল। বুঝলাম জনগণ এখানে প্রশাসনের কাজে ক্ষুব্ধ। একজনকে হাতের কাছে পেয়ে জানতে চাইলাম 'আপনারা কি সরকারের কাজে খুশি নন?' রাগী গলায় উত্তর পেলাম 'না মশাই, একদম না। দেশটা অরাজকতায় ছেয়ে গেছে। মন্ত্রীরা দূর্নীতি পরায়ণ। মানুষের ভালোর জন্য কিছুই করেনা। আমরা এই সরকারের পতন চাই।' মিছিল এগিয়ে চলল।

হাল্লায় যখন এসেছি, সেই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রটা একবার দেখে নেওয়া উচিৎ। মনে আছে এখানেই হাজার হাজার ক্ষুধার্ত, অশক্ত সৈনিক নিয়ে শয়তান মন্ত্রী সুণ্ডি আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। আর গুপি-বাঘা আকাশ থেকে মিষ্টির বৃষ্টি নামিয়ে সেটা বানচাল করেছিল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গড়ে উঠেছে বিশাল পাওয়ার স্টেশন। অসংখ্য উঁচু উঁচু টাওয়ার, অতিকায় ট্র্যান্সফর্মার, আরও কত যন্ত্রপাতি সেখানে। জানা গেল এখান থেকে প্রতিদিন দশহাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হয়। শত শত শ্রমিকের কোলাহলে জায়গাটা গমগম করছে। মাঠের অন্যদিকে রয়েছে একটা মোটরবাইকের কারখানা। তাকে ঘিরে নানা দোকানপাট, শ্রমিক আবাসন, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। সত্যিই এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে।

এই ক'দিনে প্রাণভরে অনেককিছু দেখে নিলাম। জুতোজোড়া এবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে। তার আগে একবার গুপির সেই গ্রামে যেতে হবে। ভাবছি কালই যাব। যাদুজুতো পায়ে গিয়ে দেখি গুপিদের গ্রামটা একইরকম রয়েছে। সেই পুকুর, ধানক্ষেত, কাশবন, মেঠোপথ আর নিবিড় ছায়ায় ঘেরা ছোটো ছোটো মাটির বাড়ি। একেবারে সজল বাংলার একটা ছবি যেন। দেখলাম সিনেমায় দেখা সেই বটগাছের নীচে, যেখানে গুপিকে হেনস্থা করা হয়েছিলো, বসে আছেন কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ। তবে তারা গড়গড়া টানছেন না। সিগারেট খেতে খেতে তাস খেলছেন। গুপির বাড়িটাও একই রয়েছে, একটু সংস্কার করা হয়েছে এই যা। গ্রামটা পঞ্চায়েতের অধীন।

বাড়ি এসে ন্যাশানাল মিউজিয়ামের অধিকর্তা মিঃ ভাদুড়িকে ফোন করে জানালাম যে সম্প্রতি কানহা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে আমি গুপি গাইনের জুতোজোড়া কুড়িয়ে পেয়েছি। শুনে উনি লাফিয়ে উঠলেন। 'বলেন কি মশাই? এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া। পুলিশ, সিআইডি এতদিনেও যা পারেনি আপনি সেটা উদ্ধার করে ফেলেছেন?' গলার উত্তেজনা উনি চেপে রাখতে পারছেন না। পরদিন থেকে গুপি গাইনের অমূল্য জুতো আবার যথাস্থান আলো করে রাখল।

জানিয়ে রাখি আমার এই কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকার আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একলক্ষ টাকা আর একটা সোনার পদক উপহার দিয়েছেন।

